OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 06
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 44 - 52
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue - ii, Published on April issue 2026, Page No. 44 - 52
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 - 0848

রাষ্ট্রপরিকল্পনায় জনপদনিবেশ : প্রসঙ্গ কৌটিল্যের ‘অর্থশাস্ত্র’ এবং ঘনরাম চক্রবর্তীর ‘ধর্মমঙ্গল’ কাব্য

তনুশ্রী অধিকারী
গবেষক, প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID: Tanusree.pu@gmail.com
0009-0008-5376-1555

Received Date *30. 03. 2026*
Selection Date *07. 04. 2026*

Keyword
Janapad, Kautilya, Arthasastra, Ghanaram Chakrabarty, Dharmamangal, Mediaeval, Bengal, Rarh-region, Literature, Society, Occupation, caste, Political Planning, Human-resources.

Abstract

‘Janapad-Nibesh’ is one of policy under political planning. In this section human-being is adopted as assets. As a assets of province. It would not be an exaggeration to say that, the appropriate use of human resources can propel a country or state to the pinnacle of progress. Therefore, wise kings or statesmen always seek to invest in high-quality human resources. Around the 4th Century BCE, the illustrious Kautilya— an eminent professor at Takshashila University and the Chief Advisor of the Mauryan Empire— first gave the clarity on ‘Janapad-Nibesh’. In the “Second Adhikarana” of his treatise ‘Arthashastra’, he had set highly preciousness thought and philosophy on this policy.

‘Janapad-Nibesh’ policy is a political chapter, which is a particularly educative matter. Professor Kautilya incorporated the strategy of ‘Janapad-Nibesh’ into the study of politics. In the literature of Mediaeval Bengal, We once again caught a glimpses of such political consciousness. The ‘Dharmamangal’ kabya was composed in the ‘Rarh-region’ of Bengal during the 18th Century. The prominent characters of this kabya were---Ichaighosh, Lausen, Mahamad and the king of Gaur-Empire. A remarkable resemblance was observed between the ideas of pandit Kautilya and the characters of this Rarh-region’s kabya, regarding on ‘Janapad-Nibesh’. Although it may seem irrelevant at first, but a deep analysis compels us to rethink. There was a difference on time and wisdom, but similarities had found in political thought.

Discussion

১

“রায় বলে কালুহে কিসের বোঝা ভার।
বীর বলে জাতিবৃত্তি ভূষণ আমার।।
হাসিয়া কহেন সেন দূরে ত্যজ সব।
ইনামে মাহিনা দিব বাড়াব বিভব।।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 06
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 44 - 52
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

বান্ধাব পুরট পাগ পরো পট্টধূতি।
দলুই সবার কানে দোলাইব মতি।।
ময়না পশ্চিম পাশে তুলে দিব বাড়ী।
নারীগণে তোমার পরাব পাটশাড়ী।।
কাটা কড়ি কঙ্কণ কনক কণ্ঠহার।
পরিবে থাকিবে সুখে ত্যজ দুঃখভার।।
শুনে বলে বাঁচালে কুক্কুট হংসবরা।
সেনের সঙ্কেতে চলে লয়ে পুত্রদারা।।"

- 'হস্তীবধ পালা'/ ঘনরাম চক্রবর্ত্তী বিরচিত শ্রীধর্ম্মমঙ্গল

ভাই কর্পূরকে নিয়ে লাউসেন গেছিল রাজা গৌড়েশ্বরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। তাঁদের সমগ্র যাত্রাপথই ছিল বিচিত্র অভিজ্ঞতায় পরিপূর্ণ। বাড়ি ফেরার পথে রমতি নগরে এসে দুই ভাইয়ের পরিচয় হয়েছিল কালু নামের এক ডোমের সঙ্গে। প্রথম সাক্ষাতেই লাউসেন মনঃস্থির করে নিয়েছিল যে, কালুডোমসহ রমতি নগরে আশ্রিত তেরো-ঘর ডোমকে নিজের শহর ময়নাতে নিয়ে আসবে। সামন্তপুত্র লাউসেন ডোমেদের সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবনের উক্ত প্রতিশ্রুতিখানি দিয়েছিলেন। কিন্তু তাতে শর্ত ছিল— ডোমেদের পরিবার নিয়ে রমতিনগর থেকে বাস উঠিয়ে ময়নানগরের অভিবাসী হতে হবে। লাউসেনের উক্ত প্রস্তাবকে সুখের প্রলোভন বললেও খুব একটা ভুল হবে না! প্রলোভন, বন্ধুতা নাকি চুক্তি— আমরা এই নিয়ে বিতর্ক করব না। তবে আমাদের সন্দেহ জাগে— আভিজাত বংশোদ্ভূত যুবক লাউসেনের হঠাৎ তেরো-ঘর নিম্নবর্ণীয় ডোম পরিবারের প্রতি প্রীতি দেখে!

সুখের লোভে আকৃষ্ট হয়ে রমতি নগরের ডোম গোষ্ঠী ময়না নগরে এসে বসতি গড়তে রাজি হয়ে গেছিল। ডোম পরিবারগুলি যেহেতু ছিল গৌড়রাজের আশ্রিত প্রজা, তাই সরকারি ভাবে রাজ্যের অনুমতি ভিন্ন তাঁরা নগর ত্যাগ করতে পারত না। লিখিত পরোয়ানা ছাড়া নগর ছাড়লে তা বেআইনি হত। সেই পরোয়ানা আদায়ের ধকলখানিও লাউসেন নিজের কাঁধে নিয়েছিল। অবশেষে নিজের নগরে নিয়ে গিয়ে লাউসেন ডোমদের দেওয়া পূর্বপ্রতিশ্রুতি পালনও করেছিল।

কয়েকটি ডোম পরিবারের জন্য একজন উচ্চবর্ণীয় যুবকের এতখানি আগ্রহ সত্যিই নজর কাড়ে! অনেক প্রশ্ন জমাট বেঁধে ওঠে। সামন্তপুত্র লাউসেন কেন তেরো ঘরের একটি ডোম কলোনিকে অন্যের নগর থেকে নিজের নগরে উঠিয়ে নিয়ে এসেছিল! কেন একদল অচেনা ডোমের জন্য অতখানি উপদ্রব এবং সেইসঙ্গে অর্থনৈতিক বিনিয়োগ স্বীকার করেছিল!

ঘনরাম চক্রবর্তী-বিরচির 'শ্রীধর্ম্মমঙ্গল' কাব্যে অনুসন্ধান চালিয়ে দেখা গেছে যে— কবি বলেছিলেন, ডোমেরা ছিলেন বীর এবং ভীষণ ভাবে রাজ "অনুগত"[১]। আর বুদ্ধিমান রাজপুরুষেরা কখনই অনুগত, বিশ্বস্ত প্রজাকে হাতছাড়া করতে চায় না। ডোমেদের জন্য পরোয়ানা আদায়ের প্রস্তাব নিয়ে রাজ-সমীপে লাউসেন স্বয়ং উপস্থিত হয়েছিলেন। তাঁর যুক্তিটি ছিল—

"সেন বলে আজ্ঞা কর ডোম তের ঘর।
লোকজন চাই যদি রাখিতে চাকর।।
দিনু দিনু বলি রাজা দিল লিপি দান।"[২]

রাজার সামনে লাউসেন, ডোমদের চাকর বা দাস রূপে প্রার্থনা করেছিল। কিন্তু মালিকপক্ষ হয়ে দাসগোষ্ঠীর জন্য যে আর্থিক বিনিয়োগ লাউসেন করেছিল তা পশ্চিমের দেশের 'দাসপ্রথা'র সঙ্গে একেবারেই অসঙ্গতিপূর্ণ ছিল। তেরো ঘর ডোমের প্রতি লাউসেনের এই অনুগ্রহ মনভাব আমাদের তৎকালীন গৌড়দেশের রাষ্ট্রপরিকল্পনা সম্পর্কে আরো গভীরে ভাবতে বাধ্য করে।

কৌটিল্যের নীতিকে অনুসরণ করলে, বলতে হয় যে— লাউসেন তেরো ঘর ডোমকে নিয়ে যে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তা ছিল রাষ্ট্রব্যবস্থার এক কূটনৈতিক পরিকল্পনার পর্যায়ভুক্ত। অর্থশাস্ত্রের দ্বিতীয় অধিকরণের প্রথম অধ্যায়ে এইপ্রকার

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 06
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 44 - 52
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

রাষ্ট্রপরিকল্পনাকে 'জনপদনিবেশ' নামে চিহ্নিত করা আছে। অর্থশাস্ত্রের এই অংশে মানুষ 'সম্পদ'-এর অংশ হয়ে যায়; অন্যান্য সম্পদের পাশাপাশি মানবসম্পদের উপর 'নিবেশ' বা বিনিয়োগের কথা বলা হয়েছিল।

'জনপদ' বিষয়ে পণ্ডিত নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী তাঁর 'দণ্ডনীতি' নামক পুস্তকে মূল্যবান কিছু মতামত ব্যক্ত করেছিলেন। তাঁর মতে, -

> "রাষ্ট্র, বিষয়, দেশ— এই শব্দগুলি একের পরিবর্তে অন্যটি ব্যবহৃত হলেও, জনপদ শব্দটির একটি অন্য তাৎপর্য আছে। বিশেষত, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে।"[৩]

স্পেলম্যান সহ প্রসিদ্ধ সমাজতাত্ত্বিকদের মন্তব্যকে বিচার করে তিনি আরো বলেছেন, -

> "তাঁরা কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে জনপদের বিশদ তাৎপর্য লক্ষ করে রায় দিয়েছেন যে, ভূখণ্ড এবং জনসমষ্টি— এই দুটি তত্ত্বেরই অন্তর্ভাব ঘটবে জনপদ শব্দের তাৎপর্যে। মহাভারত, মনুস্মৃতি অথবা অন্যান্য রাজনীতি বিষয়ক শাস্ত্রগুলিতে যেখানেই জনপদের উল্লেখ আছে, সেখানেই আগে জনপদবাসী মানুষের কথা আরম্ভ হয়েছে।"[৪]

২

কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্রের 'অধ্যক্ষপ্রচার'— দ্বিতীয় অধিকরণ, ১৯তম প্রকরণ অংশের আরম্ভেই 'জনপদনিবেশ' বিষয়ে একটি সংজ্ঞা আছে। তা হল—

> "भूतपूर्वमभूतपूर्वं वा जनपदं परदेशापवाहनेन स्वदेशाभिष्यन्दवमनेन वा निवेशयेत्। शूद्रकर्षकप्रायं कुलशतावरं पञ्चशतकुलपरं ग्रामं क्रोशद्विक्रोशसीमानमन्योन्यारक्षं निवेशयेत्।"[৫]

অর্থাৎ, একটি জনপদের নিবেশ করতে হলে প্রজার (মানব সম্পদের) জোগান মেটানোর জন্য রাজাকে ভিন্-রাজ্য অথবা নিজরাজ্যের জনবহুল এলাকা থেকে মানুষ সংগ্রহ করে আনতে হবে। এবং নির্মিয়মান জনপদে পরিকল্পনা মাফিক বসবাসের স্থান দিতে হবে। নীতি অনুযায়ী, জনপদনিবেশ করার সময় রাজ্যে শূদ্রজাতি, বিশেষত কৃষকদের সংখ্যা যেন অধিক থাকে— এবিষয়ে রাজার সচেতন থাকা প্রয়োজন। অতয়েব, অর্থশাস্ত্রের 'জনপদনিবেশ' প্রকরণে ভিন্-রাজ্য থেকে প্রজা এনে নিজ-রাজ্যে স্থানদান নীতির উল্লেখ পাওয়া যায়।

কৌটিল্যের জনপদনীতি বিষয়ে নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ীর অভিমতটি হল, -

> "কৌটিল্য প্রথমেই ইঙ্গিত করেছেন জনপদবাসী মনুষ্যপ্রকৃতির দিকে। অর্থাৎ, যাঁরা একটি জনপদে থাকবেন, তাঁদের সামাজিক প্রকৃতিটাই কৌটিল্যের মতে জনপদগঠনের প্রথম সোপান। ... পণ্ডিতেরা এই সম্পূর্ণ ব্যাপারটাকে 'জিও-পলিটিক্যাল' আখ্যায় চিহ্নিত করেছেন। পরিষ্কার বোঝা যায়— এখানেও ভূখণ্ড এবং জনসমষ্টির ভাবনা কৌটিল্যকে প্ররোচিত করেছে, তা না হলে জনপদবাসীর সামাজিক গঠন এবং গ্রামের কথা প্রথমেই আসত না।"[৬]

খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীর (আনুমানিক) তক্ষশীলার অধ্যাপক কৌটিল্য যে আদর্শ রাজনৈতিক নীতির কথা বলেছিলেন, বঙ্গদেশের এক কবির লেখা মঙ্গলকাব্যে 'জনপদনিবেশ' বিষয়ে সেই একই রাষ্ট্রবুদ্ধির পরিচয় পাওয়া আশ্চর্যকর ছিল। আনুমানিক ১৭১১ খ্রিস্টাব্দে বর্ধমানের রাজা কীর্তিচন্দ্র রায়ের পৃষ্ঠপোষকতায় বঙ্গদেশের-কবি ঘনরাম চক্রবর্তী লিখেছিলেন 'শ্রীধর্ম্মমঙ্গল' কাব্য। এই কাব্যের 'ঢেকুর পালা' এবং 'হস্তীবধ পালা'য় জনপদনিবেশের বেশকিছু অনুষঙ্গ খুঁজে পাওয়া গেছিল। 'ঢেকুর পালা'তে যে নগরপরিকল্পনার কথা ছিল— তা ইছাই ঘোষের ঢেকুরনগর, আর 'হস্তীবধ পালা'য় ছিল লাউসেনের ময়নানগরের কথা।

ধর্মমঙ্গল কাব্যের 'ঢেকুর পালা'র কাহিনিতে আমরা দেখি যে, গৌড়েশ্বর, সোমঘোষকে ত্রিষষ্টির গড় দেখাশোনা করতে পাঠিয়েছিলেন। ত্রিষষ্টির গড়ে গিয়ে সোমঘোষের পুত্র ইছাই ঘোষ দিনে দিনে বাহুবলে ও বুদ্ধিবলে প্রবল হয়ে উঠেছিল। ইছাই ঘোষ এতটাই প্রবল হয়ে উঠেছিল যে সে নিজেই একটি নগর গড়ে তুলেছিল।

"নিতি নিতি করে পূজা দিয়ে মেষ মোষ অজা

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 06
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 44 - 52
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

রাজা হল গোয়ালা প্রবল।”[৭]

এই সেই নবনির্মিত নগরের রাজা হয়েছিল স্বয়ং গোয়ালাপুত্র ইছাই। কোনো রাজার পুত্র রাজা নয়, এক শূদ্রপুত্র নিজ-সিংহাসন নিজে নির্মাণ করল।

ভবানীপূজারি ইছাই গড়ে তুলেছিলেন ‘ঢেকুর’ নামের জনপদ। এটি কোনো অনুদান বা পৈত্রিকসূত্রে পাওয়া রাজ্য ছিল না। অজয় নদীর কাছে চর্তুদিকে পাহাড়ে ঘেরা ঘন নিবিড় দুর্গম বন ছিল। সেই বন কেটে ইছাই ঘোষ নগর নির্মাণ করেছিলেন। ‘ঢেকুর পালা’ অংশে নগর পত্তন বিষয়ক বিবরণে বলা হয়েছিল যে—

“চৌদিকে পাহাড় বেড়িবাড়ী গড়
দুর্গম গহন কাটি।
কবিয়া চত্বর বসাল নগর
রাজার বসতবাটী।।”[৮]

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য শ্রেণির পাশাপাশি বিভিন্ন পেশার মানুষ ঢেকুরনগরে বসতি গড়েছিল। যে সকল পদবীর মানুষ এই নগরে ছিলেন বলে ঘনরাম চক্রবর্তীর কাব্যে জানা যায়, তাঁরা হলেন: কুলীন, কায়স্থ, ঘোষ, বসু, মিত্র, সিংহ, দাস, দত্ত, রাঢ়ী, গোপ, রাজবংশ, পাল প্রমুখ। এরই সঙ্গে যে সকল বৃত্তি-পরিচয়ধারী প্রজাগণকে নগরে স্থান দেওয়া হয়েছিল, তার একটি তালিকা করা হল: নাপিত, তামুলী, তাঁতি, তেলি, মালী, ধার্ম্মিক ধনিক, বণিক, কুমার, উগ্রধর্ম্মধারী, আগুরি, শাঁখারি, কর্মকার, মদক, বারুই, সুবর্ণবণিক, কেওট, কৈবর্ত্ত, ছুতার, বাইতি, জালু, রজক, চুড়িকার, বেশ্যা, ডোম, হাড়ি, শুঁড়ি, কোটাল, কিরাত, কোল। দৈনন্দিন যাপনে প্রয়োজনীয় কর্মের সঙ্গে যুক্ত থেকে ঢেকুরনগরের প্রজারা রাজকার্যের অংশ ছিল। দেখা যাচ্ছে— অধিকাংশ প্রজাই ছিল তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির নাগরিক। প্রাচীনকালের অর্থশাস্ত্রের নীতিতেও লেখা ছিল যে, নবনির্মিত জনপদের অধিকাংশ প্রজাকেই হতে হবে কৃষক বা চতুর্থ বর্ণভুক্ত। ঢেকুর পালার নগরবিন্যাস চিত্রে যেন অর্থশাস্ত্রের বাস্তবিকরণ ঘটেছিল। মধ্যযুগের তথাকথিত একজন নিচুজাতের মানুষ ইছাই ঘোষের ভাবনায় যে কৌটিল্য অনুরূপ রাষ্ট্রপরিকল্পনা দৃশ্যমান হয়েছিল— তা সত্যি বিস্ময় জাগায়। এবং রাজনীতিতে ইছাই ঘোষ যে সফল হয়েছিল তার প্রমাণ মেলে সুযোগ-সুবিধাপূর্ণ ঢেকুরনগরের বর্ণনা থেকে। ঢেকুরনগর যে কতটা সমৃদ্ধিলাভ করেছিল— তার আভাস পাওয়া যায় নিম্নলিখিত পঙক্তিতে—

“দৈববলে গড়ে গোপ রাজা হৈল পাটে।
দেবতা দানব ডরে নাহি চলে বাটে।।
পুরন্দর প্রভৃতি সভয় সুরবর্গ।
প্রতাপে গোয়ালা বেটা পাছে লয় স্বর্গ।।”[৯]

অর্থাৎ, দেবতা এবং দানবের মনেও এই নগরের সমৃদ্ধি ইর্ষা ও ত্রাসের কারণ হয়ে উঠেছিল। দেব ও দানবদের মনে যে নগরের সমৃদ্ধি ত্রাস সঞ্চার করেছিল— বলাই বাহুল্য যে তা অতি সামান্য নগর ছিল না। একজন শূদ্র মানুষের নিজ প্রচেষ্টায় নির্মিত জনপদ, যেখানকার অধিকাংশ প্রজারাই ছিলেন শূদ্র। একইসঙ্গে নিঃসন্দেহে একথা স্বীকার করা যায়, স্বাচ্ছন্দের দিক থেকে দিনে দিনে ‘ঢেকুর’ একটি সফল নগরের রূপ নিচ্ছিল। যার প্রাচুর্য দেখে স্বয়ং গৌড়েশ্বর পর্যন্ত ইর্ষান্বিত হয়ে পড়েছিল এবং ইছাই ঘোষের কাছ থেকে রাজকর আদায় করতে লোক পাঠিয়েছিলেন। ঘটনাটি এই সাক্ষ্য বহন করে যে---ইছাই ঘোষের নিজহস্তে নির্মিত জনপদটি একটি সমৃদ্ধশালী নগরে পরিণত হয়েছিল। আর নগর সমৃদ্ধির মূলে ছিল তার অভিনব রাষ্ট্রপরিকল্পনা নীতি।

অনুরূপ রাষ্ট্রপরিকল্পনার দ্বিতীয় চিত্রটি দেখতে পাই ধর্ম্মমঙ্গল কাব্যের ‘হস্তীবধ পালা’য়। ইছাই ঘোষের মতই রাজনৈতিক বুদ্ধিসম্পন্ন পুরুষ ছিলেন লাউসেন। তাঁর নগরের নাম ছিল ‘ময়না’। ময়নানগরে উন্নত গুণমান সম্পন্ন প্রজা স্থাপন বিষয়ে লাউসেনের বিশেষ আগ্রহ ছিল। তাঁর এই রাজনৈতিক বুদ্ধির নিদর্শন খুঁজে পাওয়া যায় লাউসেন ও কালু ডোমের কাহিনি অংশে। আলোচনার প্রারম্ভিক অংশে এবিষয়ে কিছুকথার উল্লেখ করা হয়েছে। লাউসেন পার্শবর্তী নগর থেকে উন্নত গুণমানের প্রজা এনে নিজনগরে বসতি দিয়েছিলেন।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 06
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 44 - 52
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

রমতিনগরের ডোম জাতির চারিত্রিক গুণ ও শক্তিকে গৌড়েশ্বর চিনতে পারেননি, অথচ যুবক লাউসেন প্রথম সাক্ষাতেই মূল্যবান মানবসম্পদ হিসেবে ডোম জাতিকে আবিষ্কার করেছিলেন। তাঁর রাজনৈতিকশিক্ষা প্রশংসনীয়! 'হস্তীবধ পালা'য় আমরা দেখি লাউসেন স্বয়ং গৌড়েশ্বরের কাছে উপস্থিত হয়ে তেরো ঘর ডোমকে 'চাকর' রূপে প্রার্থনা করেছিল; নিজরাজ্য ময়নাতে নিয়ে যাওয়ার পরোয়ানা আদায় করে নিয়েছিল। গৌড়েশ্বর খুব সহজেই ডোমদের নিয়ে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছিলেন। তিনি জানতেও পারলেন না যে কোন সম্পদ হারালেন! লাউসেন সানন্দে ও স্বসম্মানে বীর ডোম জাতিকে নিজরাজ্যে স্থান দিয়েছিলেন। 'জনপদ নিবেশে'-র প্রথম শর্তই ছিল— পার্শবর্তী রাজ্য থেকে উন্নতমানের প্রজা (মানব সম্পদ) সংগ্রহ করে এনে নিজরাজ্যে স্থাপন করতে হবে; এতে নিজরাজ্য সমৃদ্ধ হবে। মধ্যযুগ বিষয়ক গবেষক এবং অধ্যাপক সুপ্রিয় কুমার দাস বলেছিলেন—

> "নতুন নগর স্থাপন কালে পার্শ্ববর্তী রাজ্য থেকে প্রজা নতুন রাজ্যে এসে স্থায়ী বসতি স্থাপন করেছে। নতুন রাজ্যে তাদের বসবাসের জন্য স্বল্প খাজনা যুক্ত জমি ও নানা রকম উৎকোচ প্রদর্শন করতে দেখা যায়। ধর্মমঙ্গল পালায় দেখা যায় রমতিনগর থেকে বহু মানুষ ময়নায় চলে আসে। কালু সহ তের ডোম পরিবার লাউসেনের সঙ্গে ময়নায় স্থায়ী বসবাস করেছে। তাদের দলপতি কালু ডোম, তিনি আবার লাউসেনের প্রধান সেনাপতি পদে উন্নীত হয়েছে। নিম্নবর্গের মানুষের এই ঊর্ধ্বায়ন তাদের সততা, বীরত্ব ও চারিত্রিক গুণের সমাহারে। অন্যদিকে ঢেকুর গড়ে ইছায়ের— 'লোহাটা বজ্জর তার সহর— কোটাল।' লোহাটা বীর যোদ্ধা অন্ত্যজ চণ্ডাল সম্প্রদায়ের মানুষ।"[১০]

একজন রাজা যতই সুপরিকল্পিত এবং সুবিধায় পরিপূর্ণ নগর গঠন করে রাখুক না কেন, প্রজা ভিন্ন সেই নগর শূন্য থেকে যায়। একটি নগর নির্মাণের প্রধান উপকরণই হল— কর্মী মানুষের দল। যে রাজ্যের মানুষ যত উন্নত-কর্মী হবে, সেই রাজ্যের উন্নয়ন ততধিক হবে। তাই সর্বকালে— উন্নত গুণমানের মানব সম্পদ রাজপুরুষদের কাছে বিশেষ কামনার পাত্র থাকে। বারাবর রাজপুরুষেরা দক্ষ কর্মী মানুষদের প্রজারূপে কামনা করে এসেছে। এবং এরজন্য রাজাদের বিভিন্ন নীতি গ্রহণ করতেও দেখা যায়। অর্থশাস্ত্র অনুসারে 'জনপদ নিবেশ'-এর প্রথম নীতিই ছিল পররাজ্য থেকে প্রয়োজনীয় জনসমূহ (অবশ্যই উন্নতমানের প্রজা) নিয়ে এসে নিজরাজ্যে বসতি দিতে হবে এবং দ্বিতীয় নীতি ছিল নির্মিত জনপদের অধিকাংশ প্রজা হতে হবে কৃষক বা শূদ্র স্থানীয়। ইছাই ঘোষ বা লাউসেনের আচরণ দেখে এই প্রতীত হচ্ছে যে— তাঁরা কৌটিল্যের 'জনপদ নিবেশে' নীতিশিক্ষার বাস্তবিক রূপদান করেছিলেন। 'পোড় খাওয়া' বা অভিজ্ঞ রাজনীতিবিদ গৌড়েশ্বর যথাসময়ে যে কৌশলটি বুঝতে অসমর্থ হয়েছিলেন। তবে রাজপাত্র মহামদ তা ধরতে পেরেছিলেন। তিনি যে বুঝতে পেরেছিলেন, তার প্রমাণ রাখে এই পঙক্তিটি—

"তথাপি নাবড়ি করে লাউসেন লাগি।
পাত্র বলে ভাগিনা সহর গেল ভাঙ্গি।।
আসান করিয়া কত ভুলাইয়া প্রজা।
নিজ দেশে লয়ে গেল লাউসেন রাজা।।"[১১]

এর থেকে বোঝা যায়, পাত্র ছিলেন বুদ্ধিমান এবং অভিজ্ঞ কূটনীতিবিদ। এবং চতুরও বটে! সঙ্গে এও প্রমাণ হয় যে— অষ্টাদশ শতকে রাঢ়দেশের রাজনৈতিক চিন্তাধারার সঙ্গে কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের (আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীর) বিশেষ মিল ছিল। উভয় রাষ্ট্রনীতিতেই উন্নত মানবসম্পদ আমদানি করার প্রবণতা দেখা গেছিল।

৩

একটি রাজ্য নির্মাণ করার সময়, বাইরের থেকে লোক এনে বসতি দিলেই কাজ শেষ হয়ে যায় না। সামর্থ, গুণ, কর্ম অনুসারে প্রজাবণ্টন বিষয়েও সমান গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন— এটিই হল নগর পরিকল্পনা। ঐতিহাসিক তথ্য দর্শায় সে, সে রাজার রাজ্য যত বেশি সুপরিকল্পিত ছিল, তা ততই সমৃদ্ধশালী হয়েছিল। নবনির্মিত জনপদের সজ্জার উপর কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে বিশেষ গুরুত্ব আরোপিত হয়েছিল।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 06
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 44 - 52
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

'জনপদনিবেশ' অধ্যায়ে মানবসম্পদ সংরক্ষণের পাশাপাশি, সীমান্ত-সুরক্ষাতে বিশেষ কিছু কৌশল অবলম্বন করার কথা বলা হয়েছিল, যা রাষ্ট্রপরিকল্পনার অংশ ছিল। প্রান্তবর্তী অঞ্চলগুলি প্রসঙ্গে কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের উদ্ধৃতিটি হল—

"अन्तेष्वन्तपालदुर्गाणि जनपदद्वाराण्यन्तपालाधिष्ठितानि स्थापयेत्। तेषामन्तराणि वागुरिकशबरपुलिन्दचण्डालारण्यचरा रक्षेयुः।"[১২]

অর্থশাস্ত্রের 'অধ্যক্ষপ্রচার'— দ্বিতীয় অধিকরণ, ১৯তম প্রকরণের উক্ত সংস্কৃত পঙক্তিটির বঙ্গানুবাদ করলে অর্থ হয় যে, নগরসীমানায় 'অন্তপাল' দূর্গ থাকবে। তারপর নগরের সীমান্তবর্তী অঞ্চলগুলিতে বাগুরিক, শবর, পুলিন্দ, চণ্ডাল এবং বিভিন্ন অরণ্যচর জাতিদের বাসস্থান গড়ে দিতে হবে। বহিঃশত্রুর হাত থেকে তাঁরাই প্রাথমিক পর্যায়ে নগরকে রক্ষা করবে।

আমরা যদি মধ্যযুগের রাঢ়ভূমির 'ধর্ম্মমঙ্গল' কাব্যতে ঢেকুরনগর বা গৌড়দেশের মানচিত্র দেখি— কৌটিল্যের নগরভাবনার সঙ্গে সেখানকার নগরসজ্জায় আশ্চর্য দেখা যায়। ধর্ম্মমঙ্গল কাব্যের 'ঢেকুর পালা'-র এই উক্তিটি তার সাক্ষ্য বহন করে—

"পুরীর প্রান্তরে বেশ্যা থরে থরে
অন্ত্যজ জাতি অপার।।
ডোম হাড়ি শুঁড়ি বৈসে গড় বেড়ি
বিশাল কোটাল কোল।"[১৩]

ঘনরাম চক্রবর্তী তাঁর 'শ্রীধর্ম্মমঙ্গল' কাব্যে 'বেশ্যা' এবং 'অন্ত্যজ' জাতিগুলিকে একই ক্ষেত্রে রেখেছিলেন। ঢেকুর নগরের মানচিত্রের বর্ণনা অনুযায়ী, নগরপ্রান্তের ভূমি বেশ্যা ও অন্ত্যজ শ্রেণির জন্য নির্দিষ্ট করে রাখা ছিল। রাজগড়কে বেষ্টন করে ছিল ডোম, হাড়ি, শুঁড়ি, কোটাল, কোল, চোয়াড় এবং বেশ্যাবৃত্তিধারী রমনীদের বাস। সীমান্তে ব্রাহ্মণ বা উচ্চশ্রেণির বসবাসের উল্লেখ দুটি গ্রন্থের কোনোটিতেই ছিল না।

বহিঃশত্রুর আক্রমণ ঘটলে প্রান্তজনেরাই সবার আগে শত্রুদের বিপরীতে দাঁড়াত। স্বাভাবিকভাবে ক্ষয়ক্ষতি সর্বপ্রথম এঁদেরই হত; ধনে-প্রাণে সর্বাধিক নিঃস্ব এঁরাই হত। রাজাদের কাছে তাঁদের জীবনের মূল্য কমই ছিল। অথচ দৈহিক শক্তির কারণে এঁরা রাজপুরুষদের কাছে মূল্যবান ছিল। বীরবিক্রমে তাঁরা পুরীকে রক্ষা করত—

"কিরাত প্রবল রণশিঙ্গা মাদল
নিনাদে নাগরা ঢোল।।
...
চৌদিকে চোয়াড় পুরী রক্ষিবার
বীর বিক্রমে বিশাল।"[১৪]

নগর এবং পুরীর চর্তুদিকে এই সকল অন্ত্যজ জাতির প্রজারা সর্বক্ষণ পাহারা দিত। বাইরের শত্রুকে নগরে প্রবেশ করতে হলে, তাঁদেরকে প্রতিহত করে তবেই প্রবেশ করতে হত। তাঁরা রাজগড় বা নগর সুরক্ষায় অস্ত্র হাতে নিয়ে জীবনপাত করলেও, ক্ষত্রিয়ের গৌরব কোনোদিনই পাননি। উদাহরণস্বরূপ, কালু এবং তাঁর সহধর্মিনীর নামের সঙ্গে 'ডোম' পরিচয় যতখানি মিশে আছে, ক্ষত্রিয় সম্মান ততখানি নেই। জনপগুলির রীতি-নীতিই ছিল এমন!

খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে কৌটিল্যের রাজনীতি বিষয়ক পুস্তকে যে রাষ্ট্রপদ্ধতির কথা ছিল, অনুরূপ পদ্ধতি অষ্টাদশ শতকের (১৭১১ খ্রিস্টাব্দ) 'ধর্মমঙ্গল' কাব্যেও দেখা গেছিল। 'অর্থশাস্ত্র' ও 'ধর্মমঙ্গল' কাব্যে— রাষ্ট্রবুদ্ধির এমন সূক্ষ্ম মিল আমাদের বিস্ময় জাগায়!

কৌটিল্যের জনপদ নিবেশ নীতিতে যদিও প্রান্তবর্তী অঞ্চলে বেশ্যা রমনীদের বসবাসের উল্লেখ ছিল না। কিন্তু ঘনরাম চক্রবর্তী তাঁর কাব্যে অন্ত্যজ জাতিগুলির পাশাপাশি বেশ্যা রমনীদেরও কেন্দ্রবর্তী অঞ্চল থেকে সরিয়ে সীমান্তবর্তী গ্রামে স্থান দিয়েছিলেন। ঘনরামের 'শ্রীধর্ম্মমঙ্গল'-এর অভিনবত্ব ছিল এখানেই। লাউসেনের কাহিনিতে আমরা দেখি যে,

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 06
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 44 - 52
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

লাউসেন আর কর্পূর গৌড়যাত্রার উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছিল; ঘন বন পেরিয়ে লোকালয়ে প্রবেশ করে প্রথম যে গ্রামে উঠেছিলেন সেটি ছিল জামতি নগর। জামতি নগরের পরিচয় দিতে গিয়ে কর্পূর বলেছিল—

"কর্পূর বলেন শুন ময়নার ঠাকুর।
জামতি নগর নষ্ট নাবড়ির পুর।।
কায়স্থ ব্রাহ্মণ বৈদ্য বিশেষ সজ্জন।
ঐ পুরে নাই যায় সব নীচে মন।।"[১৫]

আম, জাম, পলাশ, পিপুলের সীমান্তবর্তী জঙ্গল পেরিয়ে গৌড় রাজ্যের প্রথম যে গ্রামটি ছিল— তা 'জামতি' নগর। নগরের বিশেষ সজ্জন ব্যক্তিরা পারতপক্ষে সেখানে যেতেন না। তাঁদের কাছে জামতি নগর ছিল কুলটা নারীদের বাসস্থান। কর্পূর বলেছিল—

"না যাব জামতি যায় যুবতী প্রবলা।
পথিক পুরুষ পেলে পায় পদ্মমালা।।"[১৬]

জামতি ছিল গৌড়রাজ্যের প্রান্তবর্তী গ্রাম। বিদেশি পথিক বা শত্রুসৈন্য যদি রাজ্যের মূল কেন্দ্রে প্রবেশ করতে চায়, ছলাকলায় পারদর্শী ওই সকল নারীদের অগ্রাহ্য করতে পারলে তবেই প্রবেশ করতে পারবে। আর নারী-মোহ অগ্রাহ্য করা পুরুষের কাছে তো সামান্য কর্ম ছিল না। লাউসেন নিজমনের সবলতার উপর ভর করে বলেছিল যে---জামতি নগরের নারীদের আকর্ষণে সে পথভ্রষ্ট হবে না। প্রত্যুত্তরে ভাই কর্পূর, দাদাকে সাবধান করে দিয়েছিল। পরাশর মহামুনি মীনগন্ধার প্রতি, অর্জ্জুন কৃষ্ণ-ভগিনী প্রতি যদি আকৃষ্ট হয়ে যায়— তবে "তাকে চেয়ে দাদা তুমি কত ধর গুণ।"[১৭] সুতরাং এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সীমান্তের গ্রাম পেতিয়ে বাইরের নগরের অন্তরে প্রবেশ করতে চাইলে বিশেষ মানসিক প্রস্তুতির প্রয়োজন ছিল। মন যদি কামনাসক্ত থাকে তবে প্রবেশকারী খুব সহজেই পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে। বহিঃআক্রমণ থেকে নগরকে সুরক্ষিত রাখতে— এটিকে একটি অভিনব কূটনৈতিক চাল বলা যেতে পারে। গৌড়ের মহাপাত্র রাজপ্রাসাদে দাঁড়িয়ে এবিষয়ে একটি উক্তি রেখেছিলেন। যা আমাদের অনুমানের উপর স্পষ্টতা প্রদান করে—

"কুলটা যুবতী যত জামতি নগরে।
তারা কেন ছেড়ে দেবে এমন নাগরে।।"[১৮]

বিদেশি পথিক যদি গৌড়দেশে প্রবেশ করতে চায়, তবে তাঁদের জামতি নগরের রমনীদের মোহ কাটিয়ে তবেই নগরের কেন্দ্রে আসতে হবে। আর জামতি নগরের রমনীদের মোহকে অস্বীকার করা কামাসক্ত পুরুষদের পক্ষে একপ্রকার অসম্ভব। এই প্রসঙ্গে আধুনিক কালের 'হ্যানি ট্র্যাপ' ('Honey Trap') বিষয়টির কথা মনে আসে। যেখানে বিশেষ করে নারীদের দেশের স্বার্থে ব্যবহার করা হয়। 'শ্রীধর্ম্মমঙ্গল' কাব্যে আমরা দেখি, 'কুলটা' নারীদের পাশাপাশি বলবান অন্ত্যজ মানুষদের সীমান্তবর্তী গ্রামগুলিতে রাখা হত, যা ছিল বিশেষ প্রয়োজনবশত। গৌড়ের মহাপাত্রের কথাতেই তা প্রমাণিত হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক এবং মধ্যযুগ বিষয়ক গবেষক সুপ্রিয় কুমার দাসের 'রাঢ় বাংলার জনজাতির জীবন সংগ্রাম' বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ অভিমতটি উল্লেখ করা হল—

> "ক্ষমতা লিপ্সু রাজন্যবর্গের প্রতিনিধি গৌড়েশ্বর মহামদ, ইছাই, কর্ণসেন-লাউসেন। রাজনৈতিক ক্ষমতা কুক্ষিগত করে বিভিন্ন সম্প্রদায়কে কিভাবে নিজ স্বার্থে ব্যবহার করে সে চিত্রের পাশাপাশি তাদের মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহের মধ্য দিয়ে সমাজ মেরুকরণের নতুন দিশা আমাদের সামনে উঠে আসে।"[১৯]

অধ্যাপক দাসের মতে, রাজন্যবর্গ সমাজের বিভিন্ন সম্প্রদায়কে নিজস্বার্থে চালনা করতে চাইতেন। সুতরাং, বোঝাই যাচ্ছে 'বাসিন্দা' এবং 'বসতি' — রাজাদের দ্বারা রাষ্ট্রের দুটি উপকরণকে দক্ষতার সঙ্গে সংস্থাপন করার নামই ছিল 'জনপদনিবেশ'। এটি রাষ্ট্রপরিচালনার অন্তর্ভুক্ত একটি নীতি। একথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে— মানবসম্পদের যথাযথ ব্যবহার যে কোনো দেশ বা রাষ্ট্রকে উন্নতির চরম শীর্ষে পৌঁছে দিতে পারে। সেকারণে সর্বকালে রাজপুরুষেরা উচ্চমানের সম্পদের উপর বিনিয়োগ বা নিবেশ করতে চেয়ে এসেছে।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 06
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 44 - 52
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

আনুমানিক চতুর্থ খ্রিস্টপূর্বাব্দে তক্ষশিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন বিশিষ্ট অধ্যাপক ছিলেন কৌটিল্য; তাঁর আরও একটি পরিচয় ছিল— তিনি ছিলেন মৌর্য সাম্রাজ্যের (আনুমানিক ৬০০ থেকে ১৫০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ) প্রধান উপদেষ্টা। কৌটিল্য তাঁর 'অর্থশাস্ত্র' গ্রন্থের 'দ্বিতীয় অধিকরণ'-এ মানবসম্পদের সঠিক ব্যবহার প্রসঙ্গে বেশ কিছু মূল্যবান নীতি ও যুক্তি রেখে গেছিলেন। সংস্কৃতে আলোচনাটির মূল নামই ছিল 'জনপদনিবেশ'। এখানে কর্ম-পেশা-চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভর করে রাষ্ট্রের কোন স্থানে কোন প্রজাকে রাখতে হবে— তা নিয়ে আলোচনা করে হয়েছিল। রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে এও যে একটি বিশেষ শিক্ষনীয় পাঠ— প্রাচীন অধ্যাপক কৌটিল্য তা প্রথম অনুভব করিয়েছিলেন। পুনরায় এমন রাজনৈতিক বুদ্ধির ঝলক আমরা দেখতে পেয়েছিলাম অষ্টাদশ শতকে ঘনরাম চক্রবর্তীর লেখা 'শ্রীধর্ম্মমঙ্গল' কাব্যে। মধ্যযুগের বঙ্গদেশ তখন রাজনৈতিক পালাবদলের কারণে অস্থির হয়ে উঠেছিল। সেই অস্থির সময়েও রাঢ়ভূমির সাহিত্যচর্চায় নগরসজ্জাতে গুরুত্ব দিতে দেখা গেছিল। কবি সাহিত্যচর্চার অন্তরালে রাষ্ট্রপরিকল্পনার চিত্রটিকে সংরক্ষণ করে রেখেছিলেন। তবে মধ্যযুগের বঙ্গদেশেরকবি যে কৌটিল্যকে অনুসরণ করেছিলেন— এমন প্রমাণ পাওয়া যায়নি। কিন্তু 'জনপদনিবেশ' নীতি সংক্রান্ত বিষয়ে যথেষ্ট মিল দেখা গেছিল। রচয়িতাদের মধ্যে কালের ও পাণ্ডিত্যের বৈসাদৃশ্য থাকলেও, নিজরাষ্ট্রহিত চিন্তায় যথেষ্ট সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়। এই 'জনপদনিবেশ' ভাবনার অনেকখানি সময়কে উত্তীর্ণ করে এসে আধুনিককালেও প্রাসঙ্গিকতা লাভ করে।

Reference:

১. "যো হুকুম যাইব রাজার আজ্ঞা পাই।
অনুগত হলে নাম জগতে জাগাই।।
যম দূর দোসর দলুই তের ডোম।
শাকা শুকা দুটি বেটা বলে নহে কম।।"
– মহাপাত্র, পীযূষ কান্তি (সম্পাদিত), ঘনরাম চক্রবর্ত্তী বিরচিত শ্রীধর্ম্মমঙ্গল, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০৭৩, ২০১২, পৃ. ৩৪৬

২. মহাপাত্র, পীযূষ কান্তি (সম্পাদিত), ঘনরাম চক্রবর্ত্তী বিরচিত শ্রীধর্ম্মমঙ্গল, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০৭৩, ২০১২, পৃ. ৩৪৭

৩. ভাদুড়ী, নৃসিংহপ্রসাদ, দণ্ডনীতি, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, পঞ্চম মুদ্রণ, মার্চ ২০২৩, পৃ. ১৪১

৪. তদেব, পৃ. ১৪১

৫. Basak, Radhagovinda (tran.), The Arthasastra Of Kautilya (vol. 1), General Printers & Publishers P. L., Calcutta, Third ed., 1970, p. 26

৬. ভাদুড়ী, নৃসিংহপ্রসাদ, দণ্ডনীতি, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, পঞ্চম মুদ্রণ, মার্চ ২০২৩, পৃ. ১৪৪

৭. মহাপাত্র, পীযূষ কান্তি (সম্পাদিত), ঘনরাম চক্রবর্ত্তী বিরচিত শ্রীধর্ম্মমঙ্গল, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০৭৩, ২০১২, পৃ. ৫৭

৮. তদেব, পৃ. ৫৭

৯. তদেব, পৃ. ৬০

১০. দাস, সুপ্রিয় কুমার, ধর্মমঙ্গলে প্রান্তজন, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা-৭০০০০৯, বইমেলা, ২০১৯, পৃ. ৪৬

১১. মহাপাত্র, পীযূষ কান্তি (সম্পাদিত), ঘনরাম চক্রবর্ত্তী বিরচিত শ্রীধর্ম্মমঙ্গল, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০৭৩, ২০১২, পৃ. ৩৫২

১২. Basak, Radhagovinda (tran.), 'The Arthasastra Of Kautilya' (vol. 1), General Printers & Publishers P. L., Calcutta, Third ed., 1970, p. 26

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 06
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 44 - 52
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

১৩. মহাপাত্র, পীযূষ কান্তি (সম্পাদিত), ঘনরাম চক্রবর্ত্তী বিরচিত শ্রীধর্ম্মমঙ্গল, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০৭৩, ২০১২, পৃ. ৫৯
১৪. তদেব, পৃ. ৫৯
১৫. তদেব, পৃ. ২৫৫
১৬. তদেব, পৃ. ২৫৬
১৭. তদেব, পৃ. ২৫৬
১৮. তদেব, পৃ. ৩৩৩
১৯. দাস, সুপ্রিয় কুমার, ধর্মমঙ্গলে প্রান্তজন, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা-৭০০০০৯, বইমেলা, ২০১৯, পৃ. ৪৬